বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে হিন্দুদের বার বার পরাজয়ের কারণ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে হিন্দুদের বার বার পরাজয়ের কারণ

বৈদিক যুগ বা রামায়ণ মহাভারতের সময় থেকেই আমাদের দেশের নৃপতিদের শৌর্যবীর্য এবং পরাক্রমের বীরগাথা আমরা অনেক শুনেছি পড়েছি এবং বিশ্বাসও করেছি। অথচ পারসিক সম্রাট দরায়ুস এবং গ্রীক বীর আলেকজান্ডার সহ শক, হুন, পাঠান,মোঘল প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীরা যখন বারবার ভারত আক্রমণ করে অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছিল তখন একজনও ভারতীয় নৃপতি ছিলেন না ঐ বর্বর দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে। ঐ সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীরা, বিশেষ করে পাঠান ও মুঘলরা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, শতশত জনপদ ও দেবালয় ধ্বংস করে, দেববিগ্রহ কলুষিত করে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে, অসহায় এবং দুর্বল শিশু ও নারীদের ওপর জঘন্য অত্যাচার করে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে গজনী ও আরবের দাস বাজারে যখন বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, তখন একজনও ভারতীয় নৃপতি ছিলেন না ঐ বর্বর দস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ঝাড়ে বংশে লোপ করে দিতে। অথচ পুরানে বা রামায়ণ মহাভারতে দেবাসুরের যুদ্ধ রাম-রাবন বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে বিবরণ বা অস্ত্রশস্ত্রের যে বর্ণনা আমরা পাই, পূর্বোল্লিখিত পরাক্রান্ত ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সেই পরাক্রমের ছিটে ফোঁটাও দেখা যায় নি। আসলে ইংরেজ বা মুঘল যুগের আগে মৌর্য ও গুপ্তযুগের দুএকজন ব্যতিক্রমী নৃপতির সময় ছাড়া ভারত কখনই অখণ্ড ভারত ছিল না। ভারতবর্ষ তখন ছিল বিভিন্ন নৃপতির শাসনাধীন অনেকগুলি ছোট বড় স্বাধীন রাষ্ট্র। এদের কখনই কোন বৃহৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয় নি। এরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। তাইএই নৃপতিরা যখন সত্যিকারের দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী কোন শক্তির সম্মুখীন হত, তখন ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে যেত। পরাজয় স্বীকার করা বা সবংশে নিহত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

অবশ্য পরাজয়ের আরও কয়েকটা কারণ ছিল। পরাজয়ের অন্যতম কারণ বিদেশী আক্রমণকারীদের উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র, অসাধারন রণনৈপুন্য, নিষ্ঠুরতা,জিঘাংসাবৃত্তি এবং অবশ্যই বিশ্বাঘাতকতা। আমাদের অগ্নিবাণ, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি পুঁথিপত্রতেই। বাস্তবে বাবরই ভারতে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র বা কামান ব্যবহার করে।

হিন্দু নৃপতিদের পরাজয়ের মূল কারণ অন্য। হিন্দুরা এমনিতে ধর্মীয় ভাবাপন্ন। দেশের ধর্মগুরুদের উপদেশ বা বানীতে তারা প্রভাবিত হয়। এই ধর্মগুরুরা দেশবাসীকে অহিংসা পরমধর্ম, ঈশ্বর প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, জগতে সব ঘটনা পূর্বনির্ধারিত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু ঘটে থাকে, যে যেভাবে খুশী ঈশ্বরের সাধনা করে ইশ্বরকে পেতে পারে প্রভৃতি আপ্তবাক্যে দেশবাসীকে প্রভাবিত করতেন এবং এখনও করে থাকেন। সব থেকে মারাত্মক এরা ঈশ্বরের নাম কীর্তন, জপতপ, পুজোআর্চা প্রভৃতি করতে উপদেশ দেন, কিন্তু কখনও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন না। এদের বক্তব্য যা করার ঈশ্বরই করেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। "তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।" কিংবা, "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরনী, আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি..." ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই কবে রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধতে মা কালী এসে দড়ি ধরে সাহায্য করেছিলেন। কবে রামকৃষ্ণ মা কালীকে সন্দেশ খাইয়েছিলেন সেই গল্পে মশগুল থাকি। এর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা চিন্তাও করে দেখি না। তাই সাধারণভাবে ভারতীয় হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কাছে মাথা ঠোকা আর প্রার্থনা করা

ছাড়া অন্য কিছুও যে করার থাকতে পারে চিন্তাও করে না। তাই হিন্দুদের বিশ্বাস ঈশ্বরকে মনপ্রাণ দিয়ে ডাকলে ঈশ্বরই সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তাই মনগড়া কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে এইসব ধর্মগুরুরা শিষ্য-শিষ্যাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকেন।

পূর্ববাংলায় নাকি এমন অনেক সাধুবাবা ছিলেন যারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতেন। যেমন হেঁটে হেঁটে নদী পার হওয়া, মরা মানুষ বাঁচিয়ে দেওয়া, মাটি থেকে সন্দেশ বানানো, হাত তুলে ঝড় থামিয়ে দেওয়া এবং এরকম আরও অনেক কিছু। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী নাকি একবার যোগবলে সূক্ষ্ম দেহে সোজা বিলেতে গিয়ে তাঁর বড় সাহেবের (ইংরেজ) অসুস্থ স্ত্রীকে এক রাতের মধ্যে সুস্থ করে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। অথচ সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় এই সব সাধুবাবাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মুনি ঋষি নাকি অনেক ছিলেন। কিন্তু মহঃ বিন কাসিম থেকে শুরু করে সুলতান মামুদ, তৈমুর লং, মহঃ ঘোরী, বাবর, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ আবদলি প্রভৃতি বিদেশী বর্বর দস্যুরা যখন ভারত আক্রমণ করতে আসছিল। তখন এইসব ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিরাসম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ঐ সব আক্রমণ আর তার বিভৎসতা সম্পর্কে। এদের কারও ক্ষমতা হয়নি অলৌকিক ক্ষমতা বলে ঐসব বর্বরদের আক্রমন প্রতিহত করতে এবং দেশবাসীকে রক্ষা করতে। ফলে মহান মুনি ঋষিদের বাসভূমি এই ভারতেই ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। ধ্বংস হয়েছিল শত শত জনপদ আর দেবালয়, কলুষিত করা হয়েছিল দেববিগ্রহ। অথচ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধুবাবাদের আষাঢ়ে গল্প আজও লোকমুখে প্রচারিত হয়ে চলেছে। ফলে হিন্দুরা পরিণত হয়েছে কর্মবিমুখ, স্বার্থপর, আত্মমর্যাদাহীন ঈশ্বরের নাম-জপ করা এক ক্লীব জাতিতে। তাই শত অত্যাচারেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আর হা-হুতাশ করা ছাড়া এদের প্রতিরোধের বা প্রতিশোধ নেওয়ার কোন বাসনা জাগে না।

ছোট থেকেই হিন্দুদের আত্মনির্ভরশীল হতে না শিখিয়ে কিভাবে ঈশ্বর নির্ভরশীল করে তোলা হয়, এবারে তার একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। (কথামৃতের শিক্ষা) ছোট ছেলেকে একা পাঠশালায় পাঠাবার সময় মা বলে দিলেন, "বাবা বনের মধ্যে দিয়ে এক যাওয়ার সময় যদি ভয় করে তাহলে মধুসূদন দাদাকে খুব ডাকবে।" বনের মধ্যে দিয়ে একা একা যেতে যেতে বালকটি সত্যিই খুব ভয় পেল আর 'মধুসূদন দাদা' 'মধুসূদন দাদা' বলে খুব ডাকতে লাগল। একটু পরেই বাঁশী হাতে একটি ছেলে এসে বালকটিকে বলল "ভয় কি? এইতো আমি এসে গেছি, চল তোমাকে পৌঁছে দিই।" বাড়ীতে ফিরে এসে বালকটি যখন তার মাকে এই গল্প শোনাল, তার মাও হতবাক হয়ে গেল। পরে "দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে"। এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প আমরা এখনও বিশ্বাস করে চলেছি। তা ছাড়া গীতাতেও আছে "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" তাই আমরা হিন্দুরা শত অত্যাচারেও ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকি, কবে শ্রীকৃষ্ণ অবির্ভূত হয়ে, দুস্কৃতীদের দমন করে সাধুদের রক্ষা করবেন। এবং ধর্ম সংস্থাপন করবেন; সেই আশায়। ফলে আমরা পরিণত হয়েছি যুদ্ধ বিমুখ আত্মমর্যাদাহীন এক অমেরুদণ্ডী প্রজাতিতে, অত্যাচারিত কিংবা নির্যাতিত হয়েও যাদের রক্ত গরম হয় না, প্রতিশোধ নিতে চায় না। দাঁতের বদলে দাঁত, রক্তের বদলে রক্ত যারা দেখতে চায় না।

তাই বিদেশী নরপশুরা আমাদের দেশে প্রায় ১২০০ বছর (মুসলমান ১০০০ + খ্রীস্টান ২০০) অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে পেরেছে। কোন সন্দেহ আছে কি.?